ছাতনার গাজন প্রাঙ্গন। ছবি ঃ লেখক

ছত্রিনারাজ্যের গাজন এবং উৎসবপরম্পরা

স্বরাজ মিত্র

গাজন-পার্বনের মুলুক ছত্রিনারাজ্য। ইতিহাসের বৃহৎ ছত্তিবনা, যা এককালের স্বাধীন ভৌমরাজ্যগুলির সরণীতে সামন্তভূম নামে প্রসিদ্ধ। এই রাজ্যের সহস্র বছরের কৃষ্টিপরম্পরায় সাহিত্য-শিল্পকলা-সঙ্গীত-ধর্মীয় সংস্কৃতির ধারাটি যেমন সমগ্র রাঢ়বঙ্গকে আলোকিত করে রেখেছিল, তেমনই নানান পার্বনে অনুষ্ঠিত গাজন কিংবা মেলায় আপামর মানুষের মহামিলনের ক্ষেত্রটিও ছিল সমৃদ্ধ ও অনুসরণযোগ্য।

১

কঁড়চ ভইরে দে মা গো তুই
একটা দুটা টাকা
রাইত ফুরাইলো গাজন যাব
খাব পিয়ালপাকা।

অনেক প্রাচীন গাজনের মিলনভূমি এই সামন্তভূম, যেগুলির মধ্য কয়েকটি ঐতিহ্য উজ্জ্বল, ঐতিহাসিক দিক দিয়ে অতুলনীয়। রাজ্যের দক্ষিণপ্রান্তে দ্বারকেশ্বর নদের তীরে মোলবনা গ্রামের মৌলেশ্বর শিবের গাজন, ছাতনা রাজবাড়ি প্রাঙ্গনে জঙ্গলগড়ের রানীর গাজন, মহারাজা উত্তর হামীর প্রতিষ্ঠিত আদি বাসলীমন্দির চত্বরে দেবী বাসলীর গাজন-মূলত এই তিনটি উৎসবকে ঘিরে শতকের পর শতক ধরে আজও ছত্রিনারাজ্যের মানুষ মেতে থাকেন আনন্দে, আবেগে আলিঙ্গনে। অনেকগুলি গাজন জৌলুস খুইয়েছে। পৃষ্ঠপোষকতায়

অভাবে মলিন হতে হতে হারিয়ে গিয়েছে সময়ের গর্ভে। স্মৃতির আখরগুলি শুধু রয়ে গেছে এ ভূমিখন্ডের প্রতিটি ধূলিকণায়।

একদা ছত্রিনারাজ্যের রাজধানী, অধুনা ছাতনা শহরের অদূরে মোলবনা গ্রামের মৌলেশ্বর শিবের গাজনটি এতদঞ্চলের প্রাচীনতম। প্রতিবছর চৈত্র-সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে এ মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সুদুর অতীতে ছত্রিনারাজ্যের বারোটি পরগণার বারোজন সামন্তক্ষত্রিয় ছিলেন এই গাজনের মুখ্য আয়োজক। সামন্তভূমের একমাত্র ব্রাহ্মণ নৃপতি ভবানী ঝরাইতকে চৈত্র সংক্রান্তির এই গাজনেই নৃশংসভাবে হত্যা করেন ক্ষত্রিয় সামন্তরা। ক্ষত্রিয় সাম্রাজ্যে ব্রাহ্মণরাজ্যের প্রভাব ও আধিপত্য মেনে নিতে পারেননি তাঁরা। কথিত আছে, বধ্যভূমিতে পরিণত হয়ে ওঠা সেই শৈবধামে রাজা ভবানী ঝরাইতের শিশুকন্যাকে কোলে তুলে নিয়েছিলেন রাজধানী ছত্রিনানগরের এক রজক পরিবার। রজকের গৃহে প্রতিপালিতা সেই কন্যাই পরবর্তীকালে পরিচিত হন রামী রজকিনী নামে। আদিমধ্যযুগের প্রথম বাঙালি মহাকবি বড়ু চন্ডীদাসের সাথে প্রণয়ের সম্পর্কে জড়িয়ে যায় তাঁর নাম। আজও এই একবিংশ শতকেও প্রতিবছর মোলবনা গ্রামের শৈবধামে বসে চৈত্রসংক্রান্তির শিবের গাজন। বহুসংখ্যায় না হলেও দূরদূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীরা আসেন মেলাপ্রাঙ্গনে। বিকিকিনির আসর জমে। ভক্ত্যাদের দল ছোট বৃত্তে ঘুরে ঘুরে মাতিয়ে রাখেন মেলায় আসা লোকজনের হৃদয়। ক্রমশ ভাবগম্ভীর হয়ে ওঠে গাজনের পরিবেশটি।

২

সতীন আমার মুড়কি পাইল্য
কত পুয়া রে?
ছাতনী পাই এ ধান লিব লো
রানীর দুয়ারে।

ছাতনা রাজবাড়ীর পূর্বপ্রান্তে মহীরূহ আর গাছপালায় ঘেরা নির্জন স্থানটিতে উনবিংশ শতকের শেষভাগে রানী আনন্দকুমারী নির্মাণ করেলন অপূর্ব টেরাকোটা শোভিত পঞ্চরত্ন বাসলী মন্দির। বাসলী হলেন ছত্রিনারাজ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই পঞ্চরত্ন বাসলী মন্দিরকে ঘিরেই প্রতিবছর জ্যৈষ্ঠমাসের ১০তারিখে অনুষ্ঠিত হয় রানীর গাজন। উৎসবের নামটি রানীর গাজন, তবে রাজবাড়ির দক্ষিণদিকে অধিষ্ঠিত ভৈরব হলেন এই গাজনের আরাধ্য দেবতা। মেলাটিকে কেন্দ্র করে এ ভূখন্ডের আদিবাসীদের মধ্যে একটি অভিনব প্রথা প্রচলিত ছিল, আজ যেটি প্রায় বিলুপ্ত। রানীর গাজনে আগত আদিবাসী সাঁওতাল যুবক-যুবতীরা মেলাপ্রাঙ্গনেই তাদের পছন্দের জীবনসাথী নির্বাচন করতো। পছন্দের পর্বটি সাঙ্গ হলে মেলায় একসাথে ঘুরতো তারা। একসাথে আনন্দে মেতে উঠতো। পরবর্তীকালে কোনো একটি বিশেষ লগ্নে রীতি মেনে তাদের বিবাহকার্যটি সম্পন্ন হত। ছাতনার অন্যতম প্রাচীন এই গাজনে পসার বলতে খেজুর, তালশাঁস, রঙীন কাগজের ফিরফিরি, কাঁচের চুড়ি, তালপাতার সেপাই, ফুলুরি, মোষের শিংয়ের চিরুণী প্রভৃতির প্রসিদ্ধি ছিল কিছুকাল আগেও। তবে অনেক কিছুর মতোই এই সব গ্রামীণ পণ্যগুলিরও বেচাকেনা অনেকটাই কমে গেছে। রাজবাড়ির পঞ্চরত্ন বাসলীমন্দির চত্বরে রানীর গাজন আজও বসে, তবে রানীর দুয়ারে ধান মেপে নেবার পাত্রটি, অর্থাৎ ছাতনার নিজস্ব ছাতনী পাই হারিয়ে গিয়েছে চিরকালের মতো।

৩

রাঙাধুলায় আকুল হইলা
গতরছেঁচা মন
সাঁঝে যাব চন্ডী- রামী
বাসলীর গাজন।

ছাতনা শহরের ভেতর দিয়ে চলে গেছে রানী অহল্যাবাঈ রোড. যা আজ ৮নম্বর রাজ্যসড়ক নামে পরিচিত। বর্তমান ছাতনা থানার ১৫০মিটার পশ্চিমে, এই রাজ্যসড়কের উত্তরপ্রান্তে রয়েছে ছত্রিনারাজ্য সামন্তভূমের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বাসলীর আদি মন্দির, যে মন্দিরটি ১৫৫২ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজা উত্তর হামীরের সময়কালে তৈরি হয়েছিল। উনিশ শতকের শেষভাগে পুরাতত্ত্ববিদ ও মন্দিরবিশেষজ্ঞ জোসেফ ডেভিজ বেগলার সাহেব এই প্রাচীন বাসলী মন্দিরের ভগ্ন প্রাকারের সন্ধান পান এবং তদানীন্তন গেজেটিয়ার প্রকাশিত হয় - 'The ninth soverign of the line was one Humble Uttara Roy whose inscription has been found by Beglar on the wall of Basoli Temple, has came to the throne around 1552 AD' ছাতনার ঐতিহাসিক ও প্রাচীন এই মন্দিরপ্রাঙ্গনেই আয়োজিত হয় এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় মেলাটি, যুগ যুগ ধরে যা রাঢ়বঙ্গে বাসলী গাজন নামে প্রসিদ্ধ। চৈত্রমাসে এ গাজন অনুষ্ঠিত হয়। চারদিন ধরে মহা সমারোহে চলে দেবী বাসলীর পুজো আরাধনা। সমগ্র সামন্তভূমের আপামর মানুষের উপস্থিতি এবং লোকসমাগমের নিরিখে বাসলী গাজন এক অনন্য স্বকীয়তায় আলোকিত। আজ ছাতনা বহুগুণ বেড়েছে আয়তনে। বেড়েছে শহরের জনসংখ্যাও। এককালের গ্রামীণ গাজনটি গত শতকের আটের দশক থেকেই তার চরিত্র বদলাতে শুরু করে। মেলার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যগুলির পাশাপাশি মুক্তমঞ্চগুলিতে শুরু হয় পালাকীর্তনের আসর, বিচিত্রানুষ্ঠান প্রদর্শনী, সাহিত্য সেমিনার, বাংলার বিভিন্ন প্রান্তের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের সমাবেশে বৌদ্ধিক আলোচনাসভা ইত্যাদি। বাসলী গাজন এককথায় ছত্রিনারাজ্যের শ্রেষ্ঠ উৎসব। বিশ্বের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা ছাতনার নরনারীরা তাঁদের ঘরে ফিরে আসেন বাসলী গাজন উপলক্ষেই। গাজনের আবহে মুখরিত হয়ে ওঠে মানুষের উচ্ছ্বাস, মিলনের বৃন্দগান। ঐক্যের নয়নাভিরাম এই স্রোতোধারাটি আজও প্রবহমানতার গৌরবে।

পার্বন-গাজনে গ্রামীণ পরম্পরাগুলি আজ বহুলাংশেই লুপ্তপ্রায়। ইতিহাসে, লোকশ্রুতিতে লোকমানসে, ঋতুবৈচিত্র্যে তবু এইসব মিলনক্ষেত্রের গল্পকথা ফিরে ফিরে আসে। যেসব গাজন তার প্রাচীনত্বের গৌরবে স্বীয় বৈশিষ্ট্যে জেগে আছে আজও সেই বহমানতার মধ্যে আমরা খুঁজে পাই সাবেক ছত্রিনারাজ্যের সোনার অতীতকে। তার শিরস্ত্রানে শোভিত জাতিবর্ণ নির্বিশেষে প্রসন্ন মানুষের উৎসব পরম্পরাকে।

কৃতজ্ঞতা ঃ বাসলী ও চণ্ডীদাস - শ্রী হরিদাস চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ কুমার সিংদেও, ছাতনা রাজবাড়ি।

লেখক ঃ কবি, প্রাবন্ধিক, আঞ্চলিক গবেষক ও ক্ষেত্রসমীক্ষক।